

দাঐদের জ্ঞানচর্চা

একজন দাঐ ইলাল্লাহর জানার পরিধি,
চিন্তার বিস্তৃতি ও জ্ঞান-সম্ভারের বিস্তারিত রূপরেখা

ড. ইউসুফ আল কারজাভি

ভাষান্তর : সাইয়েদ মাহমুদুল হাসান



গার্ডিয়ান

পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

ভূমিকা	১৯
ইসলামবিষয়ক জ্ঞান	১৯
কুরআন ও তাফসিরবিষয়ক জ্ঞান	২১
কুরআনের সাথে দাঈর সম্পর্ক	২৩
আল কুরআনের বৈশিষ্ট্যসমূহ	২৬
কুরআন অধ্যয়নের ক্ষেত্রে দাঈদের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণী	৪৬
তাফসির গ্রন্থসমূহ অধ্যয়নকারীর জন্য কতিপয় অসিয়ত	৮৪
সুন্নাহবিষয়ক জ্ঞান	১০৮
হাদিস অধ্যয়নের ক্ষেত্রে দাঈদের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণী	১১৫
ফিকহবিষয়ক জ্ঞান	১৫৬
আকিদাবিষয়ক জ্ঞান	১৭৭
তাসাউফ বা সুফিবাদবিষয়ক জ্ঞান	১৮১
ইসলামি নিজামবিষয়ক জ্ঞান	১৮৫
ইতিহাসবিষয়ক জ্ঞান	১৯২
ইতিহাসবিষয়ক জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে দাঈদের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণী	১৯৮
ইতিহাস অধ্যয়নের ক্ষেত্রে কিছু সতর্কতা	২০৪
ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান	২১৩

মানববিষয়ক জ্ঞান	২২৫
মানবিক শাস্ত্রসমূহের পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু দৃষ্টি আকর্ষণী	২২৭
মনোবিজ্ঞান	২২৯
সমাজবিজ্ঞান	২৩৩
দর্শনশাস্ত্র	২৩৬
নৈতিকতাবিষয়ক জ্ঞান	২৪০
প্রশিক্ষণবিষয়ক জ্ঞান	২৪১
বিজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান	২৪৩
সমসাময়িক বিষয়ের জ্ঞান	২৫৬
সমসাময়িক মুসলিম বিশ্ব	২৫৮
সমসাময়িক ইসলামবিরোধী আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহ	২৫৯
সমসাময়িক ধর্মবিশ্বাসসমূহ	২৬১
সমসাময়িক রাজনৈতিক চিন্তাধারাসমূহ	২৬১
সমসাময়িক ইসলামি আন্দোলনসমূহ	২৬৩

ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَوْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مَضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَتِهِ، وَاهْتَدَى بِهَدْيِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ-

‘আল্লাহর দিকে আহ্বানের দায়িত্ব দিয়েই নবি-রাসূলগণকে প্রেরণ করা হয়েছে। তাই তাঁরা আল্লাহর বান্দাদের মধ্য হতে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন হয়েছেন। সৃষ্টিকুলের মাঝে তাঁর প্রেরিত দূত নির্বাচিত হয়েছেন। আর এই আহ্বানের কাজকে আঞ্জাম দেওয়া রাসূলগণের প্রতিনিধিবর্গ ও উত্তরাধিকারদেরও দায়িত্ব; যারা জ্ঞান, কর্ম, খোদাভিরুতা ও সত্যবাদিতায় রাসূলগণের পূর্ণ অনুসারী হবেন।’^১

এ ছাড়াও এ আহ্বান হচ্ছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পর সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। যার ফলে মানুষ সত্যের পথ খুঁজে পায়। কল্যাণের সাথে তাঁদের ভালোবাসার সৃষ্টি হয়। ভ্রান্তি ও অকল্যাণ থেকে দূরে থাকে। সর্বোপরি অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন থেকে তাঁরা আলোর দিকে ধাবিত হতে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন—

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ-

‘তাঁর চাইতে আর কার কথা উত্তম হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করে, সৎকাজ করে এবং নিজেকে মুসলমানদের দলভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে।’ সূরা ফুসসিলাত : ৩৩

আল্লাহর দিকে আহ্বানের মর্মার্থ হচ্ছে—তাঁর একমাত্র মনোনীত দ্বীন ইসলামের দিকে আহ্বান করা। তাঁর দেওয়া হিদায়াতের পূর্ণ অনুসরণ এবং তাঁর বিধানসমূহ পৃথিবীর বুকে বাস্তবায়িত করা।

১. আল কুরআনে রাসূল ﷺ-এর অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় দাওয়াতের বাহক হওয়াকে শর্তারোপ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন—

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ-

‘বলুন, এটি আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীরা স্পষ্ট জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মহান ও পবিত্র। আর আমি কখনোই মুশরিকদের দলভুক্ত নই।’ সূরা ইউসুফ : ১০৮

মুসলিম জীবনে দাওয়াতের অপরিহার্যতার ওপর ড. সাদিক আমিন (রহ.) ‘আদ-দাওয়াতুল ইসলামিয়াতু ফারিদাতুন শারইয়্যাহ ওয়া দারুন্নাহ বাশারিয়াহ’ নামক চমৎকার একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। দাঈদের নবুয়তের জিম্মাদার আখ্যায়িত করে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। পড়ুন—‘আদ-দাওয়াতুল ইসলামিয়াতু ফারিদাতুন শারইয়্যাহ ওয়া দারুন্নাহ বাশারিয়াহ, দারুল কলম-দামেস্ক, পৃষ্ঠা : ৪৪-৪৫

ইবাদাত-সাহায্য প্রার্থনা এবং আনুগত্যের দাবিদার হিসেবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকেই একমাত্র একক মনে করা। আল্লাহ ছাড়া যাদের অনুসরণ করা হয়, এমন সকল তাগুত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা। মহান আল্লাহ সত্য সহকারে যা কিছু দিয়েছেন, সেগুলোকে সত্যায়ন এবং যা কিছু ভ্রান্ত বলেছেন, সেগুলোকে ভ্রান্ত বলে সাব্যস্ত করা। কল্যাণকর প্রতিটি কাজের দিকে মানুষকে আহ্বান এবং অকল্যাণ ও ক্ষতিকর প্রতিটি বিষয় থেকে মানুষকে সতর্ক করা। সর্বোপরি আল্লাহর দেখানো পথে নিজের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টাকে খরচ করা।^২

সংক্ষেপে যদি বলতে হয়, ইসলামের দিকে আহ্বান হচ্ছে নির্ভেজাল এক আবেদনের নাম, যা পূর্বে বর্ণিত সকল বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেই পূর্ণতা লাভ করবে। এতে ভ্রান্তির কোনো মিশ্রণ এবং আংশিক অনুসরণের কোনো সুযোগ থাকবে না।

এমন অর্থবহ একটি আহ্বান কখনোই এত সহজ বিষয় হতে পারে না, যা অনায়াসেই মানুষকে স্তব্ধ ও নির্বাক করে দেবে এবং দাওয়াতের মনোযোগী শ্রোতা হতে বাধ্য করবে কিংবা আহ্বানে সাড়া দিয়ে সহজেই সে তা গ্রহণ করে নেবে।

বিষয়টি এতটা সহজসাধ্য নয়। জমাটবদ্ধ বিবেক, রোগাক্রান্ত অন্তর এবং ক্ষমতার শক্তিতে বলীয়ানরা কীভাবে এত সহজেই সত্যের দাওয়াতকে গ্রহণ করে নেবে? কীভাবে গ্রহণ করবে ওই সকল জনগোষ্ঠীসমূহ; প্রবৃত্তির অনুসরণ যাদের বিপথগামী করেছে এবং দুনিয়াপ্রেম যাদের মোহগ্রস্ত করেছে?

এজন্যই সুমহান এ আহ্বানকে পৌঁছানোর দায়িত্বে অত্যন্ত যোগ্য ও দক্ষ দাঈদের প্রয়োজন, যাদের জীবন ইসলামের মহত্ত্ব ও সামগ্রিকতার পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করবে, যারা নিজেদের সার্বিক জীবনকে এর প্রদীপ দ্বারা আলোকিত করার পর মানুষের দিকে সে আলোকে প্রসারিত করবেন। এর মাধ্যমে তাদের প্রবৃত্তি, বুদ্ধিমত্তা ও অন্তরসমূহকেও আলোকিত করার যোগ্যতা রাখবেন। মূলকথা হচ্ছে—একজন কাঙ্ক্ষিত দাঈ হবেন সৃষ্টিশীল শক্তি তথা মোটর অথবা ডাইনামোর মতো, যিনি দাওয়াতের মাধ্যমে সমাজকে পরিবর্তন করে দেবেন।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতির বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের গবেষণা ও অভিজ্ঞতার আলোকে বলেছেন—শিক্ষাদান পদ্ধতির সার্বিক অবকাঠামোতে একজন শিক্ষকের অবস্থান হচ্ছে মেরুদণ্ডের মতো। যিনি এ ব্যবস্থাপনার আত্মাকে জাগিয়ে তোলেন। তার শিরা-উপশিরায় জীবন নামক রক্তকে সঞ্চালিত করেন। যদিও পাঠদানের এই ব্যবস্থাপনা অন্যান্য আরও কিছু উপাদান ও প্রভাবকের সমন্বয়ে গঠিত। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পাঠদান পদ্ধতি, পাঠ্যপুস্তক, পরিচালনা পর্ষদ, শিক্ষার পরিবেশ এবং গবেষণার ধরন। এখানের প্রতিটি বিষয় ভিন্ন ভিন্নভাবে সুষ্ঠু

২. ইসলামি দাওয়াতের পরিচিতি, পদ্ধতি ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে মুসলিম গবেষকগণ ব্যাপকভাবে কলম ধরেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—মুহাম্মাদ আল গাজালি (রহ.) রচিত ‘আদ-দাওয়াতুল ইসলামিয়াহ ফিল কারনিল হালি, ড. আবদুল কারিম জায়দান (রহ.) রচিত ‘উসুলুদ দাওয়াহ, ড. আবদুল্লাহ শিহাতা রচিত ‘আদ-দাওয়াতুল ইসলামিয়াহ ওয়াল ইলামুদ দ্বীনি’ এবং আনওয়ার জুন্দি (রহ.) রচিত ‘আদ-দাওয়াতুল ইসলামিয়াহ ফিল কারনিল খামিস আশার’।

ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা পালন করে। তবে শিক্ষককেই শিক্ষার এ অবকাঠামোতে জীবন্ত স্নায়ু হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

অতএব দাঈদের অবস্থানের ব্যাপারে দাওয়াহ ও নসিহত বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য কেমন হতে পারে? যেখানে দাঈ হচ্ছেন একমাত্র উপাদান, যিনি তাঁর দাওয়াতি কাজে এককভাবে সকল কার্যকলাপ পরিচালনা ও প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর এ কার্যকলাপে প্রতিষ্ঠানের ন্যায় নির্ধারিত কোনো অনুসৃত পদ্ধতি, বই-পুস্তক, সুষ্ঠু পরিবেশ এবং ব্যবস্থাপনার অংশীদারত্ব থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন দাঈ নিজেই পরিচালনা, পদ্ধতি প্রণয়ন, পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ, শিক্ষাদানসহ সকল বোঝা এককভাবে কাঁধে বহন করে থাকেন।

এজন্য দাঈদের যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের দাবি রাখে। অন্যথায় দাওয়াতি কাজের সকল পরিকল্পনা ও প্রকল্পসমূহ অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত উভয় দিক থেকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

এরই ধারাবাহিকতায় একজন দাঈকে—যিনি অজ্ঞতা, কুসংস্কার, আধিপত্যবাদ, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হতে চান—অবশ্যই আত্মরক্ষা এবং প্রতিহতমূলক বিভিন্ন অস্ত্র দ্বারা নিজেকে সুসজ্জিত করতে হবে।

নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রে প্রথম অস্ত্রটি হচ্ছে ঈমানের অস্ত্র। প্রধানতম এ অস্ত্রের অনুপস্থিতিতে অবশিষ্ট অস্ত্রসমূহ অচল হিসেবে পরিগণিত হয়। আর ঈমান কখনোই আশা-আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হয় না; বরং তা হচ্ছে অন্তরে বদ্ধমূল করে নেওয়া এবং কর্মে তার প্রতিফলনের নাম।^৩

দাঈদের দ্বিতীয় অস্ত্রটি হচ্ছে চারিত্রিক মাধুর্যতা, যা মূলত যথাযথ ঈমানের সুন্দরতম বহিঃপ্রকাশ। এজন্যই মুমিনগণ চারিত্রিক ক্ষেত্রে যত বেশি যথাযথ, ঈমানের ক্ষেত্রে তাঁরা তত বেশি পরিপূর্ণ হয়।^৪

৩. লেখক মূলত হাসান বসরি (রহ.)-এর একটি মন্তব্যকে এখানে সংযুক্ত করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, ‘কিছু মানুষ কোনো আমল ছাড়াই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় এবং বলে—আমরা আল্লাহর ব্যাপারে ভালো ধারণা পোষণ করে থাকি (অর্থাৎ এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট)। প্রকৃতপক্ষে তারা মিথ্যাবাদী। আসলেই যদি তারা ভালো ধারণা রাখত, তবে অবশ্যই ভালো কাজ করে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতো।’ তথ্যসূত্র : তাফসিরে কুরতুবি : ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬০

এ মন্তব্যকে অনেকে হাদিস বলে প্রচার করে থাকে। যদিও মুহাক্কিক আলিমগণ একে আসার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে এ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়। যেমন : রাসূল ﷺ বলেছেন—‘বুদ্ধিমান হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে আত্মপর্যালোচনার মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করে এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে। আর অক্ষম ব্যক্তি হচ্ছে যে প্রবৃত্তির অনুসরণে জীবন অতিবাহিত করে এবং আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা আশাকে লালন করে।’ ‘হাদিসের তাখরিজ’ : সুনানে তিরমিজি, ‘আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাতি ওয়ার রাকায়িকি ওয়াল ওয়ারাই আন রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’ : ২৪৫৯, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৬

৪. লেখক এখানে ঈমানের সাথে আখলাকের পারস্পরিক সম্পৃক্ততা বিষয়ে একটি হাদিসকে সংযুক্ত করেছেন। হাদিসের মূল টেক্সট হচ্ছে—

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا-

হাদিসের তাখরিজ : আবু দাউদ, অধ্যায় : আদ-দালিলু ‘আলা জিয়াদাতিল ঈমানি ওয়া নুকসানিহি’ : ৪৬৮২, তিরমিজি, অধ্যায় : মা জাআ ফি হাক্কিল মারআতি ‘আলা জাউজিহা : ১১৬২, সুনান দারেমি, কিতাবুর রিকাক, অধ্যায় : ফি হুসনিল খুলুকি : ২৮৩৪ মুসনাদে আহমদ, অধ্যায় : মুসনাদে আবি হুরাইরা : ৭৪০২

ইসলামবিষয়ক জ্ঞান

একজন মুসলিম দাঁষ্টর প্রথম কাজ কি জানেন? তাঁর প্রথম কাজ হলো—তিনি তাঁর চিন্তার জগৎকে পরিচর্যা ও প্রসারের ক্ষেত্রে ইসলামবিষয়ক জ্ঞান অর্জনে অধিক গুরুত্বারোপ করবেন। ইসলামের এই জ্ঞান মূলত একটি গাছের মতো; যার শিকড় অত্যন্ত সুদৃঢ়, শাখা-প্রশাখা অনেক বিস্তৃত এবং আল্লাহর অনুগ্রহে সার্বক্ষণিক যার ফল দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়।^৫

ইসলামবিষয়ক জ্ঞান বলতে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই সকল জ্ঞান—যা ইসলামকে কেন্দ্র করেই রচিত। অর্থাৎ ইসলামের মূল উৎসসমূহ, মৌলিক নীতিমালাবলি, এর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তা থেকে নির্গত বিভিন্ন শাস্ত্রসমূহ এই প্রকার জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। একজন দাঁষ্ট যিনি মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন, তাঁকে অবশ্যই ইসলামের ব্যাপারে যথাযথ জ্ঞানের ধারক হতে হবে। এটি অত্যন্ত যুক্তিসংগত। তিনি কখনোই সন্দেহপূর্ণ এবং আংশিক জ্ঞানকে লালন করবেন না; বরং জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে দৃঢ়তা ও গভীরতাকে গুরুত্বারোপ করবেন।

এজন্য ইসলাম বিষয়ে পারঙ্গমতা অর্জনে আমাদের এর মৌলিক গ্রন্থাগুলোর ওপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত। এর উদ্দেশ্য আমরা যেন সীমালঙ্ঘনকারীদের মতো পরিবর্তন সাধন, মিথ্যাবাদীদের মতো বানোয়াট বক্তব্য প্রদান এবং মূর্খদের মতো ভুল ব্যাখ্যা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে পারি।^৬

^৫ লেখক ইসলামি জ্ঞানভান্ডারের গভীরতা ও ব্যাপকতার বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় সূরা ইবরাহিমের ২৪ ও ২৫ নং আয়াতকে চিত্রায়িত করেছেন। যেখানে কালিমাতুন তায়্যিবাহকে এমন একটি পবিত্র বৃক্ষের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যদিও কালিমা দ্বারা আয়াতে কী উদ্দেশ্য, তা নিয়ে মুজতাহিদগণ নানা মন্তব্য করেছেন। বিস্তারিত পড়ুন—*তাফসিরে ইবনে কাসির* : ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৮২

^৬ ইবনে জারির, ইবনে আদি এবং অন্যান্য রাবীদের থেকে বর্ণিত এক হাদিসে নবীজি ﷺ বলেন—‘(কুরআন ও সুন্নাহর) সঠিক জ্ঞান প্রতিটি যুগের বিশ্বস্ত ও ন্যায্যনিষ্ঠ উত্তরসূরীরা নিজেদের মধ্যে বহন করবেন। এভাবে তাঁরা মূলত সীমালঙ্ঘনকারীদের পরিবর্তন, মিথ্যাবাদীদের বানোয়াট বক্তব্য এবং মূর্খদের ভুল ব্যাখ্যা থেকে জ্ঞানের বিশুদ্ধ ধারাকে রক্ষা করে থাকেন।’ বিভিন্ন বর্ণনা থেকে আসার কারণে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.), ইবরাহিম ইবনুল ওয়াজির (রহ.), ইবনে আবদুল বার (রহ.)সহ অনেকেই একে হাসান হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিস্তারিত পড়ুন : ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) রচিত *মিফতাহু দারিস সাআদাহ* : ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৬৩, ১৬৪

উপরিউক্ত হাদিসে রাসূল ﷺ তিন ধরনের বিকৃতি থেকে আমাদের সতর্ক করেছেন—

প্রথমত, সীমালঙ্ঘনকারীদের মতো পরিবর্তন সাধন। এ পরিবর্তন মূলত বাড়াবাড়ি এবং কঠোরতাকে চাপিয়ে দেওয়ার কারণে হতে পারে। ইসলামের সহজ ও মধ্যমপন্থার মানহাজকে উপেক্ষা করে কঠিনভাবে ইসলাম পালন মূলত একে বিকৃতির শামিল। এমন বাড়াবাড়ির ব্যাপারে সতর্ক করে নবী করিম ﷺ বলেন—‘তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকো। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তীরা এ কারণেই ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে।’ হাদিসটি ইমাম আহমদ, নাসায়ি, ইবনে মাজাহ, হাকিম, ইবনে খুজাইমাহ, ইবনে হিব্বান (রহ.)সহ সকলেই ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সনদে বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয়ত, বাতিলদের মতো জাল হাদিস সৃষ্টি। ইসলামের দুশমনরা যুগে যুগে ইসলামি জ্ঞানভান্ডারের স্বচ্ছতাকে কলুষিত করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। কুরআন বিকৃতিতে ব্যর্থ হয়ে হাদিসের নামে ব্যাপকভাবে জাল হাদিস রচনা করেছে। তাদের প্রচেষ্টাকে নস্যাত করতে রাব্বানি আলিমগণ নিরলসভাবে কাজ করেছেন। হাদিস সংরক্ষণে *উলুমুল হাদিস*, *ইলমুল জারহ ওয়াত তা’দিল*, *ইলমুর রিজাল*সহ নানা শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন। এরপরও সমাজের লোকমুখে জাল হাদিসের ছড়াছড়ি দেখা যায়। পরবর্তী আলিমগণ জাল এবং বানোয়াট বর্ণনাগুলোকে গ্রহে আবদ্ধ করেছেন। যেন মুসলিম প্রজন্ম তা থেকে সতর্ক থাকতে পারে।

এভাবেই একজন দাঈ হবেন আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বচ্ছ ও সঠিকভাবে নির্দেশিত, যার দাওয়াতে গভীর জ্ঞান ও আত্ম-উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দাওয়াতি এ মানহাজ রাসূলে আকরাম ﷺ-এর মাধ্যমে তাঁর অনুসারীদের শিখিয়ে দিয়েছেন।

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

‘বলুন, এটি আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীরা স্পষ্ট জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মহান ও পবিত্র। আর আমি কখনোই মুশরিকদের দলভুক্ত নই।’ সূরা ইউসুফ : ১০৮

অতএব, দাঈদের ইসলামি শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে অনুধাবন ও তৃপ্তি সহকারে এর গভীরতায় পৌঁছানো জরুরি। এর মাধ্যমেই তাঁদের মাঝে নানা প্রকার চিন্তা ও বুদ্ধিমত্তার নহর সৃষ্টি হবে। আর এর সুপেয় পানি পান করে উপকৃত হবে গোটা মানবজাতি।

কুরআন ও তাফসিরবিষয়ক জ্ঞান

কুরআনুল কারিম হচ্ছে ইসলামবিষয়ক জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধানতম উৎস। ইসলামের প্রতিটি বিষয়ে মৌলিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবশ্যই কুরআনের কাছে ফিরে আসতে হবে।^৭ ইবাদত ও আল্লাহর নিদর্শনাবলি, আখলাক ও শিষ্টাচারাবলি, বিধিবিধান ও নীতিমালাবলি; প্রতিটি ক্ষেত্রেই কুরআন মৌলিক নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এরপর রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ এসে সে মৌলিকত্বকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষের সামনে স্পষ্ট ও বোধগম্যরূপে উপস্থাপন করেছে।^৮

তৃতীয়ত, জাহেলদের মতো ভুল ব্যাখ্যা প্রদান। অজ্ঞতার কারণে অনেকে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে থাকেন। আবার অনেকে নানা দল ও মতের অনুসারী হওয়ায় এর সমর্থনে হাদিসকে নানাভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। ইসলামের মৌলিক নীতিমালা এবং দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে গিয়ে তারা দল-মতের সমর্থনে ইসলামকে ব্যাখ্যা করে থাকেন। বাতেনি সম্প্রদায় তাদের মতো করে ইসলামের ব্যাখ্যা দেন। মুতাজিলারা নিজেদের মতো ইসলামকে উপস্থাপন করেন। এমনকী ফিকহি মাজহাবের অনেক মুকাল্লিদরাও নিজেদের মাজহাবকে সবকিছুর ওপর স্থান দিয়ে থাকেন। এজন্য পরবর্তী সময়ে মুসলিম গবেষকগণ কুরআন ও হাদিস ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে লেখকের ‘কাইফা নাতাআমালু মাআস সুন্নাতিন নাবাবিয়াহ’ বইটি অধ্যয়ন করা যেতে পারে। পৃষ্ঠা, ৩৬-৪১

৭. অনেককে দেখা যায়, কুরআনের নির্দেশনাকে উপেক্ষা করে হাদিসের মাঝে সমাধান খুঁজতে চেষ্টা করে। আবার অনেকে কুরআন ও হাদিসের ওপর নিজেদের বিবেক ও বুদ্ধিমত্তাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

এক্ষেত্রে ইসলামের সঠিক মানহাজ জানা আমাদের জন্য জরুরি। রাসূল ﷺ মুয়াজ (রা.)-কে ইয়েমেনে গভর্নর হিসেবে নিয়োগের প্রাক্কালে জিজ্ঞেস করলেন—‘হে মুয়াজ! তোমার কাছে কোনো বিচার এলে তুমি কীভাবে তার সমাধান করবে?’

মুয়াজ (রা.) বললেন—‘(সর্বপ্রথম) আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে তা সমাধানের চেষ্টা করব।’

রাসূল ﷺ বললেন—‘আল্লাহর কিতাবে যদি এর সমাধান খুঁজে না পাও, তবে কী করবে?’

মুয়াজ (রা.) বললেন—‘তবে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ দিয়ে তা সমাধানের চেষ্টা করব।’

রাসূল ﷺ বললেন—‘আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহর; উভয়ের মাঝে সমাধান না পেলো কী করবে?’

মুয়াজ (রা.) বললেন—‘সেক্ষেত্রে আমি (কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতির আলোকে) নিজে ইজতেহাদ করে সিদ্ধান্ত নেব।’ আবু দাউদ, কিতাবুল আকদিয়াহ : ৩৫৯২

মুয়াজ (রা.)-এর মানহাজকে যুগে যুগে সালফে সালেহিনগণ গ্রহণ করেছেন। চার মাজহাবের ইমামগণও তাঁদের গবেষণায় এ ধারাবাহিকতাকে অনুসরণ করেছেন। আমাদের গবেষণাকর্মেও সঠিকভাবে তা অনুসরণ করা উচিত।

৮. কুরআনের উপস্থাপনা পদ্ধতি নিয়ে ড. আহমদ রাইসুনি লিখেছেন—

ফিকহবিষয়ক জ্ঞান

একজন দাঈর জন্য ফিকহ বা বিধিবিধানসংক্রান্ত বিষয়াবলির ওপর যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞান রাখা অত্যন্ত জরুরি। উদ্দেশ্য—যাতে ইসলামি শরিয়াহর অন্যতম মৌলিক বিষয়াবলি তথা ইবাদত, মুআমালাত বা পারস্পরিক আচার-বিধি এবং আদাব বা শিষ্টাচারসংক্রান্ত ব্যাপারগুলোতে তাঁদের স্পষ্ট ধারণা থাকে।

এ ছাড়াও ফিকহ ইস্যুতে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলির ব্যাপারে সম্যক ধারণা থাকা উচিত, যেন প্রয়োজনবোধে কোনো মাসয়ালাকে সহজেই বের করে নেওয়া যায়।

ফিকহি বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জনের বিষয়টি একজন দাঈর জন্য নিম্নলিখিত কারণে গুরুত্বের দাবি রাখে।

প্রথমত, মানুষের অন্তরে সৃষ্ট হাজারো প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা নিয়ে সাধারণত তাঁরা দাঈদের কাছে ছুটে আসে। হালাল-হারাম নির্ধারণ, ইবাদত পালনের পদ্ধতি, আদর্শ পরিবার গঠনসহ নানাবিধ জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়ে তাঁরা দাঈদের ফতোয়ার ওপর আমল করতে চায়। এমন পরিস্থিতিতে একজন দাঈ যদি ফিকহশাস্ত্রে যথাযথভাবে পারঙ্গম না হয়, তবে প্রশ্নের জবাবে হয়তো সে চুপ থাকবে; নতুবা প্রশ্নকে এড়িয়ে সেখান থেকে পলায়ন করতে চাইবে। ফলে সমাজে তাঁর অবস্থান ও গ্রহণযোগ্যতা ধীরে ধীরে নড়বড়ে হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

আর যদি সে প্রশ্নকে এড়িয়ে যেতে অক্ষম হওয়ার কারণে মনগড়া ফতোয়া দেয়, তবে তা ভবিষ্যৎ সমাজব্যবস্থার জন্য দুর্যোগের কারণ হবে; যার ব্যাপারে বিশ্বনবি ﷺ ইতঃপূর্বেই সতর্ক করেছেন। হাদিসটি ইমাম বুখারি (রহ.) ও মুসলিম (রহ.) আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে মারফু সনদে বর্ণনা করেছেন। নবি করিম ﷺ ইরশাদ করেন—‘আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে ইলম বা জ্ঞানকে তুলে নেবেন। মানুষের বক্ষ থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে না; বরং আলিমদের ইন্তেকালের মাধ্যমেই পৃথিবী থেকে জ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটবে। একপর্যায়ে যখন সমাজে আলিমের শূন্যতা দেখা দেবে, মানুষ মূর্খ ব্যক্তিদেরকে তাদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে।

‘মহাশয় আল কুরআন প্রতিটি বিষয়ের মৌলিক নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। সূরা আলে ইমরান ও সূরা হুদে যাকে ‘মুহকামাত’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লামা ইবনে আশুর (রহ.)-এর ভাষ্যমতে, ইতিকাদ, তাশরি, আদাব ও মাওয়াইজের যাবতীয় উসুলসমূহ এ মুহকামাতের অন্তর্ভুক্ত। মৌলিকভাবে রাসূল ﷺ-এর মাক্কি জিন্দেগিতে এ সকল নীতিমালা অবতীর্ণ হয়েছে। পরবর্তী সময়ে মদিনায় ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার পর কুরআন নানা বিষয়ের বিস্তারিত সমাধান পেশ করেছে। উত্তরাধিকার নীতি, বিবাহের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ নারীগণ ইত্যাদি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও হাদিসের মাধ্যমে কুরআনের নীতিমালাসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আমাদের কাছে এসেছে।’ তথ্যসূত্র : ড. আহমদ রাইসুনি, আল কুল্লিয়াতুল আসাসিয়াহ লিশ-শারিয়াতিল ইসলামিয়াহ, দারুস-সালাম কায়রো, ২০১০ ইং, পৃষ্ঠা-২৯

অতঃপর তাদের কাছেই মানুষ ফতোয়া জানতে চাইবে। অজ্ঞতার কারণে তারা যে সমাধান দেবে, তার ফলে নিজেরা এবং পুরো সমাজব্যবস্থা গোমরাহিতে নিমজ্জিত হবে।”^৯

দ্বিতীয়ত, ইসলামি শরিয়াহর বিধিবিধান-সংক্রান্ত জ্ঞানের মাধ্যমেই সমাজের প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তি এবং কুসংস্কারসমূহকে সংশোধন করা সম্ভব হয়। অতএব, একজন দাঈ যখন প্রচলিত বিদআত, সামাজিক বিভ্রান্তি এবং ধর্মীয় অজ্ঞতাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখবে সে তাঁর জ্ঞান, দক্ষতা এবং পাণ্ডিত্যের সাথে এর মোকাবিলা করবে। শুধু মনের ক্ষোভ এবং আবেগ-অনুভূতিকে কাজে লাগানো এক্ষেত্রে সঠিক মানহাজ নয়।

এখানে সংশোধনের অর্থ এই নয়, বিভিন্ন ইস্যুতে ইমামদের মাঝে সংঘটিত মতানৈক্যসমূহকে সে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে। তবে কারও বক্তব্য যদি সামাজিক অকল্যাণ ডেকে আনে তাহলে, অবশ্যই তা সংশোধনের প্রস্তাব রাখতে পারে। ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ.) অসংখ্য ইজতিহাদি মাসয়ালায় তাঁর ওস্তাজ শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর মতকে নাকচ করে দিয়েছেন।^{১০}

৯. সহিহ বুখারি, কিতাবুল ইলম : ১০০

১০. এখানে লেখকের মৌলিক পরামর্শ হচ্ছে, সমকালীন নিত্যনতুন সমস্যাকে সমাধানের ক্ষেত্রে দাঈগণ পূর্ববর্তী উলামাদের কিতাবাদির ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল না হয়ে ইসলামের মৌলিক উসুল ও মাকাসিদকে অধ্যয়ন এবং সে অনুযায়ী সমস্যাকে অনুধাবন করে সমাধানের চেষ্টা করবেন।

অষ্টদশ শতাব্দীর যুগশ্রেষ্ঠ হানাফি ইমাম ইবনে আবিদিন আদ-দিমাশকি (রহ.) হানাফি মাজহাবের ইজতিহাদ এবং ফতোয়ার নীতিমালা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছেন। *نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف* নামক শিরোনামের এক প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন—

‘জেনে রেখ, ফিকহি মাসয়ালাসমূহ ইস্তিমবাতের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ে কুরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট বর্ণনাসমূহের ওপর নির্ভর করতে হবে। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে নিজস্ব ইজতেহাদ এবং গবেষণার ওপর জোর দিতে হবে। অধিকাংশ গবেষণার ক্ষেত্রে দেখা যায় মুজতাহিদগণ সমসাময়িক যুগের পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বিবেচনা করেই ফতোয়া নির্ধারণ করে থাকেন। এমনও হতে দেখা যায়, সামাজিক পরিস্থিতিকে গবেষণা করে তাঁরা একটি ফতোয়া দিয়েছেন। অতঃপর পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে তাঁরা আবার ফতোয়ার মধ্যে পরিবর্তন এনেছেন।’ অর্থাৎ নিজেরাই নিজেদের ফতোয়ার বিপরীত মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

এজন্যই ইজতিহাদের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে, সমকালীন মানুষ, সমাজ এবং তাঁদের আচার-বিধির ব্যাপারে আবশ্যিকভাবে ধারণা রাখা।

এমন অসংখ্য বিধান রয়েছে, যুগের পরিবর্তনের কারণে যার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। সামাজিক রীতি-নীতির ভিন্নতার কারণে হুকুম পরিবর্তিত হয়েছে। প্রয়োজনের পরিস্থিতিতে যাতে রদবদল করা হয়েছে। সমকালীন ফিতনা ও বিশৃঙ্খলার কারণে যা পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে। যদি সর্বযুগে ও সর্বাবস্থায় একই হুকুমের অনুসরণ করা হতো, তবে অবশ্যই মানুষ কষ্ট ও ক্ষতির সম্মুখীন হতো। ইসলামি শরিয়াহ যে সহজ, সাবলীল ও মানবকল্যাণমূলক নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা বলে—তা পুরোপুরিভাবে লঙ্ঘন করা হতো।

এজন্যই দেখা যায়, মাজহাবের মাশায়েখগণ বিভিন্ন মাসয়ালায় ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্ববর্তী মুজতাহিদদের বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন। যা পূর্ববর্তীগণ তাঁদের নিজেদের সমাজের পরিবেশ-পরিস্থিতিকে পর্যালোচনা করে সমাধান দিয়েছিলেন। তাঁরা এটিও জানতেন, পূর্ববর্তী উলামাগণ যদি তাঁদের সময়কালে আসতেন, তবে অবশ্যই পরিস্থিতি বিবেচনায় তাঁদের পক্ষেই অভিমত প্রকাশ করতেন। মাজহাবের মুজতাহিদগণ এ মূলনীতিকে অনুসরণ করতেন বিধায় তাঁদের মতের মাঝে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হতো। বিস্তারিত পড়ুন : ড. কারজাভি, *তায়সিরুল ফিকহ লিল মুসলিমিল মুআসির*, পৃষ্ঠা-১১৫

ইসলামি নিজামবিষয়ক জ্ঞান

গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয়ে দাঈদের জ্ঞানের গভীরতা থাকাটা জরুরি। তা হলো—ইসলামি নিজাম বা ইসলামের সামগ্রিক আইন-কানুন, রীতি-পদ্ধতি, এর দর্শনগত ভিত্তি ইত্যাদি সংক্রান্ত জ্ঞান।

এখানে নিজামসংক্রান্ত জ্ঞান দ্বারা বোঝাতে চাচ্ছি—ইসলামের সামগ্রিক বিষয়ের বিশুদ্ধতম ও পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখা। ত্রুটিপূর্ণ ও আংশিক জ্ঞানচর্চার মধ্যে কোনো সার্থকতা নেই। ইসলাম নিজেকে একটি সামগ্রিক ও পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করে। মানবজীবনের ব্যক্তিগত থেকে সামাজিক, বস্তুগত থেকে আধ্যাত্মিক প্রতিটি বিষয়ে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেয়।

ইসলামের সামগ্রিক দর্শন ও নীতিমালাসমূহকে জানার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইসলামি শাস্ত্রসমূহ তথা তাফসির, হাদিস, ফিকহ, আকিদা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান রাখাটাই যথেষ্ট নয়। কেননা, প্রতিটি শাস্ত্রই ইসলামের একটি নির্দিষ্ট গাণ্ডিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। এতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে মনোনিবেশ করায় ইসলামের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে একসাথে উপস্থাপন করা হয় না। প্রতিটি শাস্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়েও তেমন গুরুত্বারোপ করা হয় না। এজন্যই ইসলামের সামগ্রিক নিজামবিষয়ক জ্ঞানটি গুরুত্বের সাথে অধ্যয়নের দাবি রাখে।

ইসলামকে যথার্থভাবে অনুধাবনের ক্ষেত্রে চারটি বিষয় অন্তরায় হতে পারে, যে ব্যাপারে আমাদের পূর্ণ সতর্কতা অত্যন্ত জরুরি।

এক. ইসলামের মৌলিক বিষয়ের আলোচনার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন অথবা পূর্ববর্তী ধর্মচর্চার নানান বিধানাবলিকে ইসলামের সাথে সংযুক্ত করা, যা প্রকৃতপক্ষে এর অন্তর্ভুক্ত নয়। সেটি পৌত্তলিকতা কিংবা বিবর্তিত ঐশীধর্ম যা-ই হোক না কেন। এ ছাড়াও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানা দল-উপদল এবং তাদের সৃষ্ট চিন্তাধারাকে ইসলামের নামে চালিয়ে দেওয়া কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আর সেটি কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যেখানে মহান আল্লাহ ইতঃপূর্বেই তাঁর মনোনীত দ্বীনকে পরিপূর্ণতার গুণে গুণান্বিত করেছেন—

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔

‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবুল করে নিলাম।’ সূরা মায়েরা : ৩

একটি পরিপূর্ণ বিষয় কখনোই তাঁর মধ্যে ত্রাস-বৃদ্ধিকে গ্রহণ করে না। এজন্যই নবি করিম ﷺ ইসলামের নামে বিদআত তথা নতুন সৃষ্ট বিষয়কে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।^{১১}

দুই. ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি হতে কোনো কিছুকে বাদ দেওয়া অথবা কোনো বিষয়কে গ্রহণ করে অপর কোনো বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করা। মূলত এটি ছিল বনি ইসরাইলের স্বভাব। তারা কিতাবের কিছু অংশকে মেনে নিত। আবার স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলে কিছু অংশকে অস্বীকার করত।^{১২} বর্তমান সময়ে এসে ইসলামকে আংশিকভাবে পালনের প্রবণতা ব্যাপকভাবে প্রকট হচ্ছে। অসংখ্য মৌলিক শিক্ষাকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে। একটি শ্রেণি শরিয়াহকে বাদ দিয়ে আকিদাকে কেন্দ্র করেই ইসলাম পালন করতে চায়।

অপর একটি শ্রেণি ইসলামের রাষ্ট্রচিন্তাকে বাদ দিয়ে ধর্মচর্চায় মগ্ন থাকতে চায়। কেউ-বা সালাতের বিধান সানন্দে গ্রহণ করলেও ইসলামের জাকাত বিধানকে গ্রহণ করতে নারাজ। অনেকে ইসলামের শান্তিপ্রিয়তাকে প্রচার করতে গিয়ে জিহাদের মতো আবশ্যকীয় বিধানকে অস্বীকার করেন। ইসলামের বিবাহ নীতিকে পছন্দ করলেও তালাকের বিধানকে অপছন্দ করেন। অথচ সামষ্টিকভাবে সকল বিষয়কে একীভূত করেই ইসলামের সৌন্দর্য। এখানে বিভাজন ও বিচ্ছিন্নতার কোনো সুযোগ নেই। আল কুরআনের আহ্বান হচ্ছে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً-

‘হে মুমিনগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো।’ সূরা বাকারা : ২০৮
তিন. ইসলামের আকিদা, ইবাদত, আখলাক ও আহকামসংক্রান্ত আলোচনায় বিভিন্ন বিষয়াবলিকে অস্পষ্ট ও বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা। অজ্ঞতা কিংবা প্রবৃত্তি চর্চার কারণে সাধারণত এ ধরনের মনগড়া ব্যাখ্যার অবতারণা হয়, যা পুরোপুরিভাবেই সত্যবিবর্জিত এবং ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক।

^{১১}. দেখুন : সুনানে ইবনে মাজাহ, অধ্যায় : ইত্তিবা’উ সুনাতিল খুলাফা’ইর রাশিদিনিল মাহদিয়্যিন : ৪২

^{১২}. মহান আল্লাহ সূরা বাকারার ৮৫ নং আয়াতে তাদের এমন আচরণের ব্যাপারে সতর্কবার্তা ঘোষণা করে বলেন—

أَفْتُمْنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُؤْمَرُ الْقِيَامَةَ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ-

‘তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশকে বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান করো? অতএব, তোমাদের যারা এমন করে, তাদের জন্য পার্থিব জগতে লাঞ্ছনা ও অবমাননা ছাড়া আর কি প্রতিদান হতে পারে? এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিন শাস্তির মধ্যে নিষ্কিণ্ত হবে। আর তারা যা কিছু করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ গাফেল নন।’ সূরা বাকারা : ৮৫

ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান

ইসলামবিষয়ক জ্ঞানচর্চা একজন দাঈর জন্য অপরিহার্য। সেক্ষেত্রে ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান থাকাটা সমান গুরুত্বের দাবি রাখে। ইসলামের যাবতীয় জ্ঞানসমূহ দাওয়াতের কাজে দাঈদের প্রধানতম অবলম্বন হিসেবে কাজ করে। আর ভাষা ও সাহিত্য হচ্ছে সে সকল জ্ঞানভান্ডারকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একমাত্র বাহন।

প্রথমত, দাওয়াতের ফলপ্রসূতার ক্ষেত্রে ভাষাগত শুদ্ধতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাজ্ঞলতা, শব্দচয়ন এবং ব্যাকরণগত শুদ্ধতা দাঈর বক্তব্যকে সঠিকভাবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। উপস্থিত শ্রোতারা এর চমৎকারিত্ব দ্বারা বিমোহিত হয়। বক্তব্যের নির্যাসকে তাঁরা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে।

অতএব দাওয়াতের ক্ষেত্রে শব্দগত কিংবা উচ্চারণগত ভুলের প্রকাশ ঘটলে তা দাওয়াতের সৌন্দর্যকেই নষ্ট করে দেয়। মানুষ তাঁর দাওয়াতকে শোনার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। যদিও উচ্চারণগত ভুলের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না, কিন্তু ভাষার আবেদনকে তা নষ্ট করে দেয়।

একটু চিন্তা করে দেখুন, একজন দাঈ কথা বলতে গিয়ে التَّبَعَةُ শব্দের উচ্চারণ যদি التَّبَعَةُ বলেন অথবা الأَهْبَةُ শব্দ বলতে গিয়ে যদি الأَهْبَةُ বলেন, তবে শুনতে কতটা খারাপ শোনা যায়। সম্পূর্ণ আলোচনায় একটি শব্দের উচ্চারণে ভুল হলেও তা শ্রোতাদের কানে বেঁধে যায়। তাদের অন্তর দাওয়াতকে গ্রহণ করার ব্যাপারে নিরাশ হয়।

কেউ কেউ আবার ব্যাকরণগত শুদ্ধতার বিষয়টিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করেন। পেশের জায়গায় তাঁরা জবর পড়েন। জবরের জায়গায় পেশ পড়েন। ব্যাকরণগত পদসমূহের কোনটি আগে বসবে আর, কোনটি পরে বসবে, সেক্ষেত্রে তেমন গুরুত্বারোপ করেন না। ইজাফত, হরফে জার ইত্যাদি নিয়মাবলি অনুসরণের তোয়াক্কা করেন না।^{১০}

দাওয়াতের ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত ভুল মানুষের হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহির দিকে ঠেলে দেওয়ার কারণ হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমন ভুল মূল অর্থকে বিকৃত করে দেয়। শরিয়াহ ও আকলের সাথে সাংঘর্ষিক অর্থের দিকে ধাবিত করে।

^{১০}. লেখক আরবি ভাষাভাষী হওয়ায় আরবি ব্যাকরণ থেকে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। বাংলা ভাষাভাষীদের জন্যও বিষয়টি সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।

আর এমন ভুল যদি আল্লাহর কালামকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে হয়, তবে তা আরও ভয়াবহ বিষয়। একবার এক বেদুইন কোনো এক ইমামের পেছনে নামাজে দাঁড়ালেন। এরপর ইমামকে তিলাওয়াত করতে শুনলেন—

وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا-

আয়াতে لَا تُنْكَحُوا শব্দের ত-এর ওপর পেশের পরিবর্তে তিনি জবর পড়েছিলেন, যার অর্থ দাঁড়ায়—তোমরা (মুমিন পুরুষরা) ঈমান গ্রহণ না করা পর্যন্ত মুশরিকদের (পুরুষদের) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে না।

অথচ আয়াতটি হচ্ছে—

وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا-

‘ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষদের সাথে (তোমাদের নারীদের) বিবাহ দিয়ো না।’ সূরা বাকারা : ২২১

তখন বেদুইন লোকটি বলে উঠল—‘মুশরিকরা ঈমান গ্রহণ করলেও তাদের সাথে আমরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হব না।’

লোকেরাও বলাবলি করতে লাগল—‘সে ব্যাকরণগত ভুল করেছে। আয়াতটি কুরআনে এভাবে আসেনি।’

বেদুইন লোকটি বললেন—‘তাকে ইমামতির জায়গা থেকে সরিয়ে দাও এবং পরবর্তী সময়ে তাকে আর নিয়োগ দিয়ো না। কেননা, মহান আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন, সে তাকে হালাল সাব্যস্ত করেছে।’

সারকথা হচ্ছে—আরবি ভাষাগত জ্ঞানের ক্ষেত্রে দক্ষ না হলে একজন দাঈ কুরআন ও হাদিসকে কখনোই যথাযথভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে না।

ছাত্ররা একবার আমাকে জানিয়েছিল, তারা এক ব্যক্তিকে এ কথা বলতে শুনেছে— ‘হাওয়া (আ.)-কে প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর আদম (আ.)-কে। সুতরাং মানবসভ্যতার সূত্রপাত নারীর মাধ্যমে ঘটেছে।’

আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম—‘এ বক্তব্য তারা কোথায় পেয়েছে?’

তারা বলল—‘মহাগ্রন্থ আল কুরআনে। সূরা নিসার প্রথম দিকে এ বক্তব্যটি এসেছে।’

আমি তখন এই ভুল অনুধাবনের আসল কারণটি বুঝতে পারলাম। মূলত আরবি ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই সে এমন মন্তব্য করেছে।

সূরা নিসার প্রথম আয়াতটি হচ্ছে—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً-

‘হে মানবসমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের একজন নাফস থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তাঁর জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সে দুজন হতে বহু নরনারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।’ সূরা নিসা : ১

মন্তব্যকারী মনে করেছে, আয়াতে زَوْجُ শব্দ দ্বারা পুরুষ অর্থাৎ আদম (আ.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, আদম (আ.) যদি প্রথম সৃষ্টি হতেন এবং হাওয়া (আ.)-কে যদি আদম (আ.) থেকে সৃষ্টি করা হতো, তবে অবশ্যই আয়াতটি এমন হওয়া দরকার ছিল—

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَتَهَا-

অর্থাৎ زَوْجُ শব্দের জায়গায় زوجة শব্দটি অধিক যুক্তিযুক্ত ছিল। আর এটি অত্যন্ত প্রচলিত ও ব্যবহারিক একটি পরিভাষা যে, زَوْجُ শব্দটি পুরুষের ক্ষেত্রে এবং زَوْجَةٌ শব্দটি নারীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

লোকটির হয়তো জানা নেই, তাফসিরশাস্ত্রের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে— কুরআনের শব্দবলিকে শাব্দিক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই ব্যাখ্যা করা হবে। কিন্তু ব্যবহারিক অর্থের মাধ্যমে নয়। কেননা, শব্দের প্রচলন কিংবা ব্যবহার সময়ের পরিক্রমায় পরিবর্তিত হয়।

আল কুরআনের ভাষাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, زَوْجُ শব্দ দ্বারা পুরুষ জাতিকে যেমন উদ্দেশ্য করা হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে নারীদের ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে এ শব্দের ব্যবহার এসেছে।

আদম (আ.)-কে উদ্দেশ্য করে মহান আল্লাহ বলেন—

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ-

‘আমি বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো।’ সূরা বাকারা :

৩৫

এখানে মহান আল্লাহ أَنْتَ وَزَوْجُكَ শব্দ ব্যবহার করেননি।

বিজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান

ইলম বা জ্ঞান শব্দটিকে ভাষাবিদগণ যে অর্থে ব্যবহার করে থাকেন, এখানে সেটি আমার উদ্দেশ্য নয়। এ ছাড়াও পূর্ববর্তী যুগের যুক্তিবিদ্যা, তর্কশাস্ত্রসহ বিভিন্ন জ্ঞানের ধারায় এ পরিভাষাটির ব্যবহারও আমার উদ্দেশ্য নয়। কুরআন ও হাদিসসহ অন্যান্য ইসলামি জ্ঞানের ধারায় ইলম শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেটিও এখানে উদ্দেশ্য নয়; বরং ইলম দ্বারা এখানে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে—আধুনিক সময়ের বহুল সমাদৃত একটি পরিভাষা, যাকে Science হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। পাশ্চাত্য সমাজে এ পরিভাষাটি ব্যাপক প্রচলিত হওয়ার পাশাপাশি আমাদের সমাজেও দিন দিন এর গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে চলেছে।

পাশ্চাত্যের সংজ্ঞায় علم বা Science হলো—যা পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার আলোকে নির্ণীত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ Physics, Chemistry, Botany, Zoology, Astronomy, Anatomy, Medical Science ইত্যাদি শাস্ত্রের কথাই বলা যেতে পারে।

আধুনিক বিজ্ঞানের এ সকল জ্ঞানের ধারায় দার্শনিকদের বিচরণ করতে হবে। তবে তাঁদের এ সকল শাস্ত্রের ওপর বিশেষজ্ঞ হওয়ার ব্যাপারে আমি পরামর্শ দিচ্ছি না। আর সেটি কোনোভাবে সম্ভবও নয়। কেননা, মানুষের আয়ুষ্কাল অত্যন্ত সীমিত। তাদের পরিশ্রমের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। আর জ্ঞান-সমুদ্রের তো কোনো কিনারা নেই। এর কোনো উপসংহার সে কখনোই খুঁজে পাবে না।

আমি দার্শনিকদের এ সকল শাস্ত্রের ওপর রচিত সহজ ও সাবলীল গ্রন্থসমূহকে অধ্যয়নের ব্যাপারে পরামর্শ দেবো, যেগুলো মূলত সাধারণ পাঠকদের জন্য রচিত। এ ছাড়াও বিভিন্ন গবেষণাপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞানবিষয়ক আর্টিকেলগুলোকে অধ্যয়ন করা যেতে পারে। জ্ঞানচর্চার মুসাফিরদের উদ্দেশ্যে এ সকল গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। দার্শনিকগণ তাঁদের সহযোগী হবেন এটাই কাম্য।

তবে সবকিছুর পূর্বে একজন দার্শনিক করণীয় হচ্ছে—যে সকল মৌলিক নীতিমালার ওপর আধুনিক বিজ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে, তা ভালোভাবে অধ্যয়ন করা। এক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞানসমূহ অধ্যয়ন অত্যন্ত গুরুত্বের দাবি রাখে। বিজ্ঞানের মৌলিক জ্ঞান অর্জিত হলেই কেবল পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তা-ভাবনায় এগিয়ে যাওয়া যাবে।

সাধারণভাবে জ্ঞানীদের জন্য এবং বিশেষভাবে আল্লাহর পথের দাঈদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ের জ্ঞানার্জন সময়ের দাবি। আর সেটি নিম্নোক্ত কারণে হতে পারে—

এক

আমাদের বর্তমান জীবনপদ্ধতি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার পাশাপাশি আমাদের জীবনযাত্রায়ও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পৃথিবীতে এমন কোনো ঘর খুঁজে পাওয়া মুশকিল, যেখানে বিজ্ঞানের কোনো না কোনো আবিষ্কার এখনও প্রবেশ করেনি। ইলেক্ট্রিসিটি থেকে শুরু করে নানা যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র বিজ্ঞানেরই অবদান; এমনকী মসজিদের অভ্যন্তরেও বিজ্ঞানের বিভিন্ন নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে দেয়াল ঘড়ি, সাউন্ড সিস্টেম, রেকর্ডিং সিস্টেম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি ক্ষেত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বিকশিত। মানুষের জীবনযাত্রা বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার সাথে সাথে সহজতর হচ্ছে। সুতরাং একজন দাঈর জন্য এটি কখনোই সমীচীন নয়, সে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবেষ্টিত একটি সমাজব্যবস্থায় বেড়ে উঠবে, অথচ এ সংক্রান্ত মৌলিক কোনো জ্ঞান তাঁর মধ্যে থাকবে না।

দুই

বিজ্ঞানের মতো স্বচ্ছ জ্ঞানের ধারায় অসংখ্য বিভ্রান্তিকর চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়। অতঃপর ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে প্রশ্নবিদ্ধ করার প্রচেষ্টায় এ সকল বিকৃত চিন্তাধারাকে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। এক্ষেত্রে Charles Darwin প্রণীত Theory of Evolution-এর কথাই সর্বাগ্রে উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিবর্তনবাদের মতো এমন মস্তিষ্কপ্রসূত মতবাদসমূহের ব্যাপারে দাঈদের ধারণা রাখতে হবে। সুষ্ঠু গবেষণা ও পর্যালোচনার আলোকে এ সকল চিন্তাধারাকে মূল্যায়ন করতে হবে। ধারণাপ্রসূত কিংবা প্রসিদ্ধ মতবাদ হওয়াকে বিবেচনায় না রেখে সঠিক অধ্যয়ন ও গবেষণার আলোকে এ বিষয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। সুতরাং এ সকল বিষয়ের ব্যাপারে মানুষকে সতর্কীকরণের পূর্বে পর্যাপ্ত জ্ঞানার্জন আবশ্যিক।^{১৪}

তিন

বিজ্ঞানের বাস্তবিক নানা দিক রয়েছে, যা ইসলামকে অনুধাবনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শরিয়াহর বিভিন্ন ইস্যুগুলোকে প্রাসঙ্গিক ও বাস্তবসম্মত হিসেবে উপস্থাপন করে এই বিজ্ঞানই। ইসলামকে কেন্দ্র করে যত সন্দেহ-সংশয় এবং বিভ্রান্তির অপচেষ্টা চালানো হয়, সেসবকে খণ্ডন করার ক্ষেত্রেও বিজ্ঞান যুগান্তরকারী ভূমিকা পালন করে। এমনি কিছু দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

^{১৪}. এক্ষেত্রে মুহাম্মাদ আহমদ বাশমিল রচিত আল-ইসলাম ওয়া নাজারিয়াতুদ দারওয়িন, সালামাহ মুসা রচিত নাজারিয়াতুত তাতাওউর ওয়া আসলুল ইনসান, শামসুদ্দিন আক-বালুত রচিত দারওয়িন ওয়া নাজারিয়াতুত তাতাওউর এবং অন্যান্য কিতাবাদি অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

প্রথম : ইসলামি আকিদা ও মূল্যবোধসংক্রান্ত অসংখ্য বিষয় রয়েছে, যা সহজভাবে অনুধাবনের ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা ও পর্যালোচনাসমূহ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এর ফলে দেখা যায়, সমাজের বিজ্ঞানমনস্ক জনসাধারণও ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে বিজ্ঞানের সামঞ্জস্যতা খুঁজে পাওয়ায় সহজে তা গ্রহণ করে নেয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ইসলামি আকিদার কথাই বলা যেতে পারে। এখানে সবচাইতে মৌলিক ইস্যুটি হচ্ছে—এক আল্লাহর অস্তিত্বকে সাব্যস্ত করা। বিশ্বজগতের স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহর অস্তিত্বকে প্রমাণ করার ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞান কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

বস্তুবাদ এবং নাস্তিক্যবাদের অনুসারীরা সব সময় স্রষ্টার অস্তিত্বহীনতাকে প্রমাণের চেষ্টায় লিপ্ত। তাদের এ মিথ্যা দাবিকে যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে খণ্ডন করার কাজে বিজ্ঞানের গবেষণাসমূহ উপস্থাপন করা যেতে পারে। Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry, Zoology, Medical Science ইত্যাদি জ্ঞানের শাখা-প্রশাখাসমূহ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করে।

আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণে আধুনিক বিজ্ঞানের ভূমিকার বিষয়ে অসংখ্য কিতাবাদি রচিত হয়েছে। Abraham Cressy Morrison রচিত *Man Does No : Stand Alone* গ্রন্থটি এক্ষেত্রে উল্লেখের দাবি রাখে। অতঃপর গ্রন্থটি আরবিতে অনূদিত হয়ে নামকরণ হয়েছে *العلم يدعو إلى الإيمان*। এ ছাড়াও আমেরিকার ৩০ জন গবেষক সম্মিলিতভাবে রচনা করেছেন অনবদ্য একটি গ্রন্থ *العلم يتجلى في عصر العلم*। ড. আহমদ জাকি তাঁর *الله في السماء* গ্রন্থেও এ বিষয়ক নানা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণকে উপস্থাপন করেছেন।

মুসলিম গবেষকগণও তাঁদের লেখনীতে ইসলামি আকিদার আলোচনায় বিজ্ঞানের সহযোগিতা নিয়েছেন। শাইখ নাদিম জিসর রচনা করেছেন *কিসসা তুল ঈমান বাইনাদ-দ্বীন ওয়াল ইলম ওয়াল ফালসাফা*। ভারতের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ওয়াহিদুদ্দিন খান রচনা করেছেন *আল ইসলামু ইয়াতাহাদ্দা* নামক অসাধারণ একটি গ্রন্থ। পরবর্তী সময়ে এ গ্রন্থকে বিশ্লেষণ করে আবদুস সাবুর শাহিন আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন—যার নামকরণ করা হয় *মাদখাল ইলমি লিল ঈমান*।

অতীতের সময়গুলোতে যারা ফালসাফা ও কালামশাস্ত্র চর্চা করতেন, তাঁদের একটি বিশ্বাস এমন ছিল—মানুষের মৃত্যুর পর পরকালীন হিসাব-নিকাশের সময় সে তাঁর আমলগুলোকে দেখতে পাবে না। শুধু আমলের ফলাফল দেখতে পাবে। কেননা, আমলসমূহ হচ্ছে মূলত অস্তিত্বশীল বস্তুর মতো। আর একই বস্তু দুটি ভিন্ন সময়ে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না।

মহান আল্লাহ বলেন—

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ۔

‘সেদিন মানুষ বের হবে ভিন্ন ভিন্ন দলে, যাতে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়।’ সূরা জিলজাল : ৬

অন্য আয়াতে তিনি বলেন—

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا
بَعِيدًا-

‘যেদিন প্রত্যেক আত্মা যা কিছু নেক আমল করেছে এবং যা কিছু বদ আমল করেছে, তা বিদ্যমান পাবে; সেই আত্মা কামনা করবে যদি তার এবং ওসবের (তার মন্দ কর্মফলের) মাঝে দূস্তর ব্যবধান হতো।’ সূরা আলে-ইমরান : ৩০

এ আয়াতদ্বয়সহ অন্যান্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তাঁরা বলেন—এখানে পরকালীন জীবনে এসে আমল দেখতে পাওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমলের ফলাফল দেখতে পাওয়া। অর্থাৎ তারা শুধু ফলাফলটা জানতে পারবেন।

আধুনিক বিজ্ঞান এসে সাব্যস্ত করল, মানুষের প্রতিটি কথা ও কাজকে স্পেসিসের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। প্রতিটি ঘটমান বিষয়কে সংরক্ষণে রেখে যেকোনো সময় তা কাজে লাগানো যায়। কোনো বিষয় সংঘটিত হওয়ার দীর্ঘ সময় পরেও একে পুনরায় পর্যবেক্ষণ করা যায়।

এর অর্থ দাঁড়াল—প্রতিটি মানুষ তার জীবনের সামগ্রিক কথাবার্তা ও কাজকর্মকে মুভি আকারে সংরক্ষণ করতে পারবে। তাঁর জীবনের অতি ক্ষুদ্র বিষয় থেকে শুরু করে বৃহদাকার যাবতীয় বিষয়াবলি এতে সংরক্ষিত থাকবে। রূপক কোনো আকৃতিতে নয়; বাস্তবিক পক্ষেই মানুষ তার সামগ্রিক জীবনকে এভাবে চোখের সামনে দেখতে পাবে। যদিও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এখনও এ আবিষ্কারের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হতে পারেনি, তবে এর সম্ভাবনাকেও তারা উড়িয়ে দিচ্ছেন না।

দ্বিতীয় : আধুনিক বিজ্ঞান তার গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এমন অসংখ্য বিষয়াবলিকে সাব্যস্ত করেছে, যা ইসলামি শরিয়াহর সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিভিন্ন হুকুম-আহকাম প্রবর্তনের ক্ষেত্রে ইসলাম মানবকল্যাণ সাধন এবং অকল্যাণকে দূরীকরণের যে মূলনীতি গ্রহণ করেছে, বিজ্ঞানের আবিষ্কার সে বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করেছে।

ইসলামি শরিয়তের সাথে বিজ্ঞানের সামঞ্জস্যতার কারণে মুমিনদের ঈমান আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপরীতে যারা ইসলামি শরিয়তের পূর্ণাঙ্গতা, ব্যাপকতা, সর্বজনীনতা এবং কার্যকারিতার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন, তাদের অবস্থান দুর্বল হয়েছে।